আজকের কাগজ

তারিখ 20 MAR 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

22

ছাত্র হত্যা ও পুলিশের ভূমিকা

কে এম সোবহান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসীদের টার্গেট প্র্যাকটিসের জায়গা হয়ে গেছে। এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা আছে, শিক্ষকরা আছেন। এঁদের থাকার কথাই এখানে। আর আছে বহিরাগতরা। তাদের মধ্যে একদল সন্ত্রাসী আর একদল সন্ত্রাসবিরোধী অন্ততপক্ষে তাই তাদের হওয়া উচিৎ পুলিশ বাহিনী। গত ১৩ তারিখ ছিল শুক্রবার কাজেই কোন ক্লাস না থাকায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ছিল না এবং শিক্ষকরাও ছিলেন না। ছিল সন্ত্রাসীর আর পুলিশ বাহিনী। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ছড়িয়ে পড়ল ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের বা তিন গ্রুপের মধ্যে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ছাত্রলীগ সভায় বক্তব্য রাখছিলেন তখন তাঁকে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বাদলের লাশ উপহার দেয়া হলো। এরপর থেকেই একটা চাপা উত্তেজনা চলছিল ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে। ছাত্রলীগের যে অংশ বাদলকে হত্যা করল-সেই অংশটিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল বিএনপি'র ছাত্রদল। এই অভিযোগ করেছে ছাত্রলীগের অপর অংশ।

গত ১৩ তারিখে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা আর ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের মধ্যে টিএসসিতে এক খন্ড বন্দুকযুদ্ধ হয় যেখানে শতাধিক রাউন্ড গুলিবর্ষিত হয়। এই বন্দুকযুদ্ধ পুলিশের উপস্থিতিতেই অর্থাৎ তাদের অবস্থান থেকে কয়েক হাত দুরেই হয় এবং পুলিশ পূর্বের মত নিষ্ক্রিয় থাকে। সন্ত্রাসীরা দুই পক্ষ যেমন তাদের নিরাপদ স্থানে ফিরে যায় তখন সন্ত্রাসবিরোধী একটি মিছিল বের হয়। এই ধরনের প্রতিবাদ মিছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বর্তমান অবস্থায়। এই সন্ত্রাসবিরোধী মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ করা হলো এবং নঈম হোসেন রাজু নামে ছাত্র ইউনিয়নের একজন নেতা নিহত হলো। ক্যাম্পাসে গত নয়মাসে এটা সপ্তম মৃত্যু। প্রতিবারই যখন একটি ছাত্র সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হয়, নিহতের পিতামাতা বলেন, এটাই যেন শেষ মৃত্যু হয়। ছাত্র-শিক্ষক, জনসাধারণ অভিভাবক সকলেই ঐ একই কথার পুনরুক্তি করেন। কিন্তু শেষ হয়েও সন্ত্রাসীদের বুলেট শেষ হয় না আর তার সাথে ছাত্রদের হত্যাও শেষ হয় না।

রাজুর লাশ তার পিতা নিয়ে গেলেন। যাবার সময় বললেন "কারো বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই।" একজন পিতা যখন পুত্রের লাশ বহন করার সময় এ কথা বললেন, তখন তাঁর মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এ মৃত্যু যদি স্বাভাবিক হতো বা যদি কোন দুর্ঘটনাজনিত কারণে হতো তাহলে পিতার বাষ্পরুদ্ধ বাক্যে জনমনে হয়তো এই কথাই উঠত যে পিতা স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছেন এই মৃত্যু। কিন্তু রাজুর মৃত্যু হলো তারই সতীর্থদের হাতে বা তাদেরই বেশধারী সন্ত্রাসীদের হাতে। রাজুর পিতা ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী অর্জন করার জন্যে। রাজু সন্ত্রাসী ছিল না, অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল সে বরং সতীর্থদের সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে যে কোন বিবেকবান নাগরিকের মত বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে এসেছিল তারই মত আরও ছাত্রদের সঙ্গে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে, ক্যাম্পাসে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে। তাদের এই মানবিক উদ্যোগ বরদাস্ত করল না সন্ত্রাসীরা তাদের হাতের বন্দুক সক্রিয় হলো, প্রাণ দিলেন রাজু। রাজু মারা গেলেন এক মহৎ কাজে উদ্যোগী হয়ে। শান্তির ললিত বাণী সত্যই মিথ্যা পরিহাসের মতই শোনাল। ছাত্র ইউনিয়ন দায়ী করেছে সরকারী দলের অংগসংগঠন ছাত্রদলকে। তারা থানায় অভিযোগও করেছে ছাত্রদলের চারজনের বিরুদ্ধে।

স্বাধীনতার পূর্বে পাকিস্তানের স্বৈরাচারী সরকারের বিক্ষুব্ধ আন্দোলনে মারা গেছে কিশোর ছাত্র মতিয়ুর, যুবক আসাদ। স্বাধীনতা-উত্তরকালে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল নূর হোসেন। তার গায়ে লেখা পোস্টার ছিল "স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক।" মতিয়ুর আসাদের রক্তের পথে পাকিস্তানীরা ভেসে গেল, নূর হোসেনের রক্তে ডুবে গেল এরশাদের আসন। স্বৈরাচার নিপাত গেল, গণতন্ত্র মুক্তি পেল। একটি নির্বাচিত সরকারের হাতে যখন প্রশাসনিক ক্ষমতা, যখন গণমানুষ গণতন্ত্রের কথা বলছে সরকারী দল থেকে অহরহ নিজেদের গণতন্ত্রী বলে প্রচার চালাচ্ছে ঠিক তখনই তাদেরই ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের হাতে মৃত্যুবরণ করলেন সন্ত্রাসবিরোধী মিছিলে ছাত্রনেতা রাজু। এমনটি কি হবার কথা ছিল? আগে দোষারোপ করা হতো স্বৈরাচারী শাসককে। কিন্তু এখন তো স্বৈরাচারীর হাতে শাসনক্ষমতা নেই। যাদের হাতে আছে তাদের ভোট দিয়েছে জনগণ এই আশাতো যে, দেশে গণতন্ত্রের অনুশীলন হবে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে ধাপে ধাপে। গণমানুষ গণতন্ত্রের চর্চা দেখছে না সরকারী দলের কাছ থেকে। তারা হতাশাগ্রস্ত। সেই কারণেই বোধকরি রাজুর পিতা ক্ষুব্ধতার সঙ্গে বললেন, কারও বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ নাই। তাঁর পুত্রের লাশ তিনি বহন করে নিয়ে গেছেন এর চেয়ে ট্রাজিক বোধহয় আর কিছু নাই। অভিযোগ করে ফল কি হবে? ডঃ মিলন নিহত হলেন। তাঁর হত্যার বিচার যখন আরম্ভ হলো দেখা গেল একের পর এক সাক্ষীকে সরকার পক্ষ 'হস্টাইল' বলেছেন। সে হত্যার বিচারে কি হবে তা বিচারের রায় বার হলেই বোঝা যাবে। সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিতে সাহস পান নাই এটাই মনে হয়, তা না হলে একটি মামলায় এতগুলো সাক্ষী "হস্টাইলে" হওয়াটা কিছুটা অস্বাভাবিক।

রাজুর পিতার অভিযোগ নাই। কিন্তু এই হত্যায় অভিযুক্ত পুলিশ তাদের নিষ্ক্রিয়তার জন্যে। এই নিষ্ক্রিয়তার জবাব দাবী করছে জনগণ, সংসদীয় গণতন্ত্রের জবাবদিহিতা একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা চলে গেল

একজন বিদেশী নাগরিক বিনা ভিসায় ১৪ বছর দেশে বসবাস করে কোন্ আইনে তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলতে পারে না। ওয়াজ মাহফিলকে কেন্দ্র করে মৌলবাদী শক্তি ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ায় সেক্ষেত্রেও পুলিশ নীরব।

গণমানুষ যখন গণহত্যার উস্কানির দায়ে, নারী ধর্ষণের প্ররোচনার দায়ে গোলাম আযমের বিচারের দাবী করে তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশ আসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসতে উনিশ ঘন্টার নোটিশে।

পরদিন শনিবার ১৪ তারিখে যখন গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের শোক মিছিল বার হয় তখন একদিকে ছাত্রদলের গুলিবর্ষণ অপরদিকে পুলিশের এলোপাতাড়ি লাঠিচার্জ এবং কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষিপ্ত হলো শোক মিছিলের উপর। যারা আগেরদিন হত্যা করল রাজুকে তাদের কাউকে গ্রেপ্তার করল না পুলিশ। পরদিন যারা গুলি চালাল শোক মিছিলের উপর তাদেরও কেউ গ্রেপ্তার হলো না। এর কারণ জানাতে পুলিশ বিভাগ বাধ্য। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদ করাতে কয়েকজন ছাত্রকে একজন পুলিশ অফিসার গালাগালি করেন। পুলিশ নিষ্ক্রিয় এই প্রথমবারের মত নয়। তারা বরাবরই নিষ্ক্রিয় সন্ত্রাসীদের দমনে। ইতিপূর্বে